বিড়ি-শ্রমিক
রণজিৎ দাশ

নিশ্চল মূর্তির মতো একাসনে বসে থেকে
আজীবন বিড়ি বাঁধে দেহাতি শ্রমিক।
গাড়িবারান্দার কোণে। শান্ত ও প্রসন্ন, যেন সুজাতার অন্নে তৃপ্ত মুখ—
যেন এই বেশহরে তাকে ঘিরে আছে তার ভুট্টাক্ষেত, বালবাচ্চা, দেহাতমুলুক।
প্রতিদিন লক্ষ্য করি। এই বৃদ্ধ শ্রমদাস—অজ্ঞ ও যান্ত্রিক—
তবুও সন্দেহ হয়,
মার্ক্সীয় চোখে তাকে যেটুকু জেনেছি, সে কি তার চেয়ে কিছুটা অধিক?

প্রথম স্তোত্র
মৃণাল চক্রবর্তী

ক্ষুব্ধ কেন জটাজাল? ওড়ে কেন চঞ্চল পতাকা
দেবী, তুমি রুষ্ট নাকি? মূর্তিমতী দয়াবতী হও
তোমার ঘরের মধ্যে বিগত জন্মের ছবি আঁকা
এছাড়া কোথায় যাবো? ইন্দ্রিয়ে চেতনা উধাও।
একদা ঈশ্বর ছিলো। অন্য সব দেবতারা প্রায়ই
রাত্রিবেলা যেতো আসতো, দরজায় পাল্লা ছিলো না
দয়াবতী হও দেবী, খোয়া গেছে নিষ্পাপ মেয়েটি
তাছাড়া সে ঋতু নেই। স্থির হও। শুরু করো বোনা
ঊর্ণনাভ দৃশ্যজাল। আমি থাকি অপেক্ষায়—শীতে
যাতায়াত করো তুমি হিমদৃশ্যে—প্রেমের অতীতে।

তিনজনে লঞ্চের ডেকে
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোৎস্নায় সমুদ্র দেখার মতো অভিজ্ঞতা আমাদের কখনো ছিল না,
আমার, মনে এই লঞ্চের ডেকে বসা তিনজন উদাসী যুবক
হাতে পানপাত্র নিয়ে জ্যোৎস্নায় ভিজছি তুমুল—
কুশলের চোখে-মুখে হুইস্কির রক্তাভ চাউনি,
ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলল, ‘রাতুল, এই জলকল্লোলে
পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে পড়ে যায়,
আমরা কি লঞ্চেই আছি, নাকি হেঁটে চলেছি অন্য
কোন এক গুহার উদ্দেশে?’
রাতুল ঝিমোচ্ছে খুব, চোখ ঘুমে জড়ানো গলায়
হাসল সহসা, ‘মেয়েফেয়ে না-হলে কিন্তু এই লঞ্চ-ট্রিপ
মোটেই মানায় না, হাহ্—’
আমি হুইস্কির ঝাঁঝে মোটে রপ্ত নই, হাতে তৃতীয় বিয়ার নিয়ে
জ্যোৎস্নায় সাঁতার কাটছি, মৃদু বলি, ‘দ্যাখ্,
ফসফরাস জ্বলছে দূরে ঢেউয়ের মাথায়,
তার কিছু আলো পেলে জ্যোৎস্না আরেকটা ফর্সা হত বুঝি—’
এ-ভাবেই ছোট-ছোট ডায়ালগ দূর থেকে ভেসে আসে সাঁই-সাঁই
হাওয়ার উল্লাস, ঢেউয়ের আবার গর্জনে সমুদ্রশাসন চলে অবিরাম।
আর এই চালচিত্রে ছোট-ছোট চুমুকে আমরা
বাস্প হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ...

নিকানোর পার্‌রা, তোমার প্রভাবে

সুবোধ সরকার

আমি চাই, রাস্তার দু-ধারে বসে ছেলেমেয়েরা ছবি আঁকুক
আমি চাই, আজ এখনই প্রত্যেকে সত্য কথা বলে উঠুক
আমি চাই, কলকাতা প্রজাপতিতে ভরে যাক
আমি চাই, সমস্ত পার্টি-অফিস দখল করে নিক ভিখিরিরা।
অন্তত পাঁচজন লোককে হাসপাতাল থেকে আমরা যেন
বাড়ি পাঠাতে পারি, অন্তত এই শতাব্দীর শেষে।

আমি চাই, বিপজ্জনক সব ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলা হোক
যিনি বলেছিলেন নারী নরকের দ্বার
তিনিই আসলে বেশ্যাখানার প্রতিষ্ঠাতা
আমি চাই শেষ কিছু মৃত লোক এখানে ফিরে আসুক
আর বৃষ্টি হোক
এগারো বছর ধরে বৃষ্টি হোক
কিন্তু সেই বাদল অধিবেশনের আগে
আমি চাই সমস্ত মন্ত্রীরা হরিণ হয়ে যাক।

বহুদিন, আমরা একঝাঁক হরিণ দেখিনি।

ভেড়াবৃত্তান্ত

দিব্য মুখোপাধ্যায়

কে কোথায় অন্ধকারে ডুবে গেল সে আমরা হিসেব রাখি না
ফ্যাকাসে ভেড়ার দল চলে শুধু ফাঁকা পার্কে, সারাদিনমান,
সকাল-সন্ধের মতো, জন্ম-মৃত্যু ওঠে পড়ে ভেজা হিম মাঠে—
বাজে কার ভেরী দূরে আর ঘুম ভাঙে ক্লান্ত মেষপালকের।
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে দু-একটা ভেড়া রোজ এখানে-ওখানে
মাংসের দোকানে ঝুলে থাকে নিঃসঙ্গতায়—লোহার আংটায়—
তাদের আত্মার গান বেজে ওঠে হোটেলের টেবিলে-টেবিলে
ডুবে যায় তার গন্ধে অভিমান, আমাদের বেঁচে থাকা, প্রেম।

সবুজ সমুদ্রে ঝড়—দ্যাখো, ফুঁসে জেগে ওঠে অনন্তে আবার
ছোঁড়া-ছুঁড়িদুটো ফের ঝাঁপ মারে অবেলায় কলেজ পালিয়ে
দু-হাতে খুঁড়তে থাকে হাবা এক বুড়ো যেন পাতাল সন্ধানে
হাইওয়ের ঝড়ে ট্রাক ভাসে শুধু অবিরাম নগরে-বাজারে।
যে-ভেড়ারা ফেরে রোজ মাথা গুঁজে প্রতিদিন গুন্‌তিতে সঠিক
তাদের গোঙানি গান ওড়ে হায় ছেঁড়াখোঁড়া বাতাসে-বাতাসে

দাগী

জয় গোস্বামী

নতুন কবি, আমি তোমার তরুণ ঘৃণায় উপচে উঠি
বাড়ি ফেরার সময় আমি তোমার দেওয়া নিন্দাচিহ্ন
সঙ্গে নিয়ে যাই

তরুণ কবি, আমি তোমার অরুণ-বরণ ক্রোধের অর্থ
বুঝতে যদি চেষ্টা করি, দোষ নিয়ো না, তুমি আমার
ভাইয়ের ছোট ভাই

তরুণ কবি জানো, আমায় বিষাদময় একটি মেয়ে
আকুল করার চিঠি লিখেছে? আমি তাকে তোমার দিকে
এগিয়ে দিতে চাই

তরুণ কবি, আমি তোমার ক্রোধের সামনে ঘৃণার সামনে
আজীবনের লেখা আমার পেতে রাখবো ধুলোয়, তুমি
যেমন খুশি মাড়িয়ে যেয়ো ছাই।

সাতাশে এপ্রিল

অভীক ভট্টাচার্য

দ্যাখো, কেমন মন্ত্রের মতো আরেকটি বিকেল নেমে এল।

এখন কোথাও কেউ নেই, যতদূর দেখা যায় শুধু
রোগা রাস্তাটুকু পড়ে আছে, চোখে তার নিঃঝুম বয়স—

তবু দ্যাখো, এই অবেলায় হাওয়া উঠল নারকেলপাতায়,
আর, দোতলা বাড়ির ছাদে উঠে এল লাল-নীল ঘুড়ি,—

কেউ কি আসবে তবে?

কেউ কি আসবে আজ, হাওয়া?

কলমিলতার গান

বীরেন শাসমল

এইমাত্র হাওয়া এসে থুতনি ধরে নেড়ে দিল তার, যেন
কেশরফোলানো ঘোড়া, যুবাবয়সের এক চপল বালক
কানের ললিতে লেখা লাল-লাল উজ্জল আঁধার, রুমালে
ফেলল মুছে, তরুণ স্বভাবে নাচল মত্ত নাচ জলের
শরীরে, কামুক সূর্যের ঠোঁট খড়পোড়া কলমি কি জানে,
গোপন পালক তুলে চুপি-চুপি চুমা দিয়ে চলে গেল
পগারের পার? কেউ জানল না শুধু একটি বিরল পুঁটি
লজ্জা পেল, ফিক করে দেখে গেল হেসে, কী পাপ
রৌদ্রে ধুলো, রৌদ্রবিলাসিনী মেয়ে, কলমিলতার।

বসে আঁকো

পৌলমী সেনগুপ্ত

দিনক্ষণ বাঁধা আছে, স্থানকালপাত্র সবই স্থির
বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হবে, আকাশের
কোনায়-কোনায় সরু মোটা নরম কঠিন
নানারকম তুলি, দুয়েক-পাত্র রং,
নিয়মকানুন তেমন-কিছু নেই, শুধু তুমি নেবে
লাল ও হলুদ, আমি নেব নীল ও সবুজ—

আমি আঁকলাম নদী আর গাছ, মেঘ, জল,
ঝোপে বুনোফুল, মিশ্রমাধ্যম, সাম্প্রতিক ছবির ধরনে

শেষঘন্টা বাজবার আগে দেখলাম চুরি করে
তুমি কী এঁকেছ। এইটুকু ছোট্ট কাগজ
কখন পেরিয়ে গেছ—আকাশ বাতাস
ঘাসবন কাশবন বালিয়াড়ি ছেড়ে গেছ,
সাতসমুদ্দুর তেরোনদী তেপান্তরের মাঠ
জুড়ে আমারই এক ত্রিমাত্রিক ছবি এঁকে
ফেলেছ তুমি, প্রকৃত নির্জনে বসে আছি
অতন্দ্র একলা, ডানগালে তেলরং মাখা,
আর বাঁ-চোখের তারায় তুমি তখনও
সযত্নে বসিয়ে দিচ্ছ...

বৃষ্টির বিষয়ে একটি প্রবন্ধ

সুমিতেশ সরকার

বৃষ্টির বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে হয়েছিল কাল
আর নিকোনো অঙ্কের খাতায়
আমি এঁকে দিয়েছিলাম ছোটনাগপুর চাইবাসা গিরিডি
তোমাদের জঙ্গল-বাড়ি, কিছু লতাপাতা আর
চিনে-উপকথা-থেকে-উঠে-আসা বিরাট ড্রাগন—

আমাদের নিখাদ নীরবতা দেখে আজ
খুলে যায় বস্তির সামান্য কপাট, নিষিদ্ধ আলো এসে
ভিড় করে অগোছালো চোখের পাতায়
ক্রমশ অস্বচ্ছ হয় পোষমানা মায়াবী দুপুর;
আদিগন্ত মেঘ ডেকে ওঠে—

বৃষ্টির বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে অলৌকিকভাবে
আমার এ-সমস্তই মনে পড়ে গিয়েছিল কাল
আর নিকোনো অঙ্কের খাতার ভাঁজে-ভাঁজে আমি এঁকে দিয়েছিলাম
মহুয়াগন্ধ রানীবাঁধ আর কুসুমডুংরীর ধুলো-ওড়ানো আলোর প্রহরগুলি...